IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বিকাশমান ভারতের ভিত্তি : বর্তমান শিক্ষা কাঠামোয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র একটি সামগ্রিক রূপরেখা

Foundation of Viksit Bharat: A Comprehensive Outline of NEP-2020 in the Context of Current Educational Framework

শ্বেতা চ্যাটার্জী

স্টেট এডেড কলেজ টিচার (SACT)

পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ

উমেশ চন্দ্র কলেজ

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Mobile: 9831836316

ID: 0009-0001-1085-4013

Key words: Viksit Bharat, National Education, National Education Policy (NEP) 2020, Twenty-first Century, Mother tongue, Regional Language, Competency-based assessments, Formative assessments, School Structure (5+3+3+4), Flexibility, Course choices, Holistic development

Abstract: Education is not only a means of acquiring information, but also a mirror of the socio-economic emancipation and bright future of a nation. To achieve this objective and to improve the education system, the National Education Policy was formulated in India in 1968 and 1986. The NEP 2020 is designed to meet the needs of the 21st century. It is a revolutionary step in the education system of India. The 5+3+3+4 education system replaced the 10+2 system. It is a scientific framework for Early Childhood Care and Education and intellectual development. The policy also proposes landmark reforms in mother tongue education, multidisciplinary education, vocational training and 'multiple entry and exit' in higher education. The policy also emphasizes the use of artificial intelligence in education to match the needs of the era. That is, on the one hand, teaching in the mother tongue and preserving Indian cultural heritage, on the other hand, making India a 'Global Knowledge Superpower' by combining modern technologies like artificial intelligence. That is why this paper has tried to analyze and evaluate the relevance of NEP 2020 in the present education system by adopting a descriptive approach vis-à-vis' how

this new policy is working to overcome the limitations of the traditional education policy of 1986 and create a modern, creative and multifaceted education system suitable for the knowledge-based world of the 21st century. The policy also seeks to provide a holistic framework for making India a global knowledge superpower by integrating modern science with ancient Indian traditions and ensuring universal quality education.

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন কেবল একটি প্রশাসনিক পরিবর্তন নয়, বরং এটি একটি জাতির স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতির প্রতিফলন। একটি দেশ কতটা আধুনিক এবং প্রগতিশীল হবে, তা নির্ভর করে সেই দেশের শ্রেণিকক্ষে কী শেখানো হচ্ছে এবং কীভাবে শেখানো হচ্ছে তার ওপর। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে ১৯৮৬ সালের 'জাতীয় শিক্ষানীতি' এবং ২০২০ সালের 'জাতীয় শিক্ষানীতি' দুটি প্রধান মাইলফলক। এই দুই নীতির মধ্যবর্তী সাড়ে তিন দশকের ব্যবধানে ভারত ও বিশ্ব—উভয়ই এক আমূল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। ১৯৮৬ সালের নীতিটি ছিল একটি উদীয়মান উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটানোর হাতিয়ার, আর ২০২০ সালের নীতিটি হলো একুশ শতকের জ্ঞান-নির্ভর বিশ্বমঞ্চে ভারতের নেতৃত্বের দাবিদার হওয়ার ব্লু-প্রিন্ট। আসলে ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতি যখন প্রণীত হয়, তখন ভারত ছিল এক সন্ধিক্ষণে। সেই সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল শিক্ষার প্রসার এবং সুযোগের সমতা আনা। দেশজুড়ে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করাই ছিল তৎকালীন সরকারের মূল লক্ষ্য। এই নীতিতেই প্রথমবার সারা দেশে অভিন্ন শিক্ষাকাঠামো হিসেবে '১০+২' ব্যবস্থার প্রবর্তনও করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম—সব প্রান্তের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড তৈরি করা। এছাড়াও গ্রামীণ ভারতের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য 'জওহর নবোদয় বিদ্যালয়' স্থাপন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ভৌত কাঠামো নিশ্চিত করার জন্য 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড'-এর মতো প্রকল্পগুলি ছিল ১৯৮৬ সালের নীতির অনন্য সংযোজন। মূলত এই রূপরেখাটি ছিল একটি পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক নীতি, যেখানে জোর দেওয়া হয়েছিল স্কুলছুট কমানোর ওপর এবং মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার ওপর। আর তাই তৎকালীন প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও এই নীতিটি ভারতকে একটি মজবুত ভিত্তি প্রদান করেছিল। তবে সময়তো আর থেমে থাকে না। ১৯৯০-এর দশকের বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং তার পরবর্তী তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। একুশ শতকের পদার্পণে দেখা গেল, কেবল ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী তৈরি করলেই দেশের প্রয়োজন মিটছে না; প্রয়োজন এমন এক প্রজন্মের যারা সৃজনশীল, দক্ষ এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম। আর তাই ১৯৮৬ সালের নীতিটি সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে কিছুটা ম্লান হয়ে আসছিল। তথ্যের ভারে জর্জরিত পাঠ্যক্রম এবং মুখস্থ বিদ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আসলে ভারতবর্ষের মতো এক বৈচিত্র্যময় দেশে শিক্ষার ধারা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সোপান। আর তাই এই মুক্তির জন্যেই প্রয়োজন ছিল নতুন একটি শিক্ষানীতির, যা কিনা জাতীয় বিকাশ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবজীবনের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের চাবিকাঠি হিসেবে সর্বজনীন ও গুণগত শিক্ষা প্রদান করতে পারবে। তাই NEP ১৯৮৬ প্রকাশিত হবার দীর্ঘ ৩৪ বছর পর আত্মপ্রকাশ করে ২০২০ সালে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিটি (NEP 2020)। ডঃ কে. কাস্তুরিরঙ্গন (প্রাক্তন সভাপতি, ইসরো কমিটির রিপোর্ট 31 মে 2019)-এর সভাপতিত্বে ২৯ শে জুলাই, ২০২০ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 ঘোষণা করে। যেখানে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য কেবল পুঁথিগত বিদ্যার উপরেই নয়, বরং শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, মননশীলতা এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর উপরেও সমানভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য তৈরী করাও হয়েছে এক আধুনিক শিক্ষাকাঠামোর। অর্থাৎ বলা যায় যে, ২০৩০ সালের

'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট'(SDG 4) লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে এবং একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চাহিদার সাথে সাযুজ্য রেখে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০'– র প্রণয়ন হলো এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মসংস্থানের প্রেক্ষাপটে গতানুগতিক মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিশ্লেষণাত্মক, সমস্যা-সমাধানমূলক এবং বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা ও নালন্দার মতো গৌরবময় ঐতিহ্য এবং চরক, আর্যভট্টের মতো মনীষীদের অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এই শিক্ষানীতি দেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে আধুনিকতারও এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন যে শিক্ষকরা; তাদের যথাযথ সম্মান, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার রূপরেখাও এই নীতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া সমাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সমানাধিকার নিশ্চিত করে শিক্ষাকে একটি সার্বজনীন জনসেবামূলক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে করা হয়েছে। একি সাথে এই নীতি বিজ্ঞান, কলা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা খেলাধুলার মধ্যে কোনো কঠোর বিভাজন না রেখে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে। ঠিক তেমনই প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, বহুভাষিকতার চর্চা, এবং সাংবিধানিক ও মানবিক মূল্যবোধের জাগরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কেবল পুঁথিগত শিক্ষায় আবদ্ধ না রেখে তাদের সৃজনশীলতা, নৈতিকতার, যৌক্তিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোরও চেষ্টা করেছে এই রূপরেখা। আর এই খানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা যেন সম্পূর্ণ মিলে যায়। তিনি বলছেন, "The highest education is that which does not merely gives us information but makes out life in harmony with all existence"[1] অর্থাৎ, সর্বোচ্চ শিক্ষা কেবল আমাদেরকে তথ্যই সরবরাহ করে না, আসলে সেটি জীবনের সকল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যের দ্বারা আবদ্ধ হতে শেখায়।

সুতরাং বলা যায় যে, এই শিক্ষানীতির চূড়ান্ত রূপকল্প হলো ভারতকে বিশ্বের দরবারে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আর সেই জন্যেই এমন এক যুবসমাজ তৈরি করা, যারা নিজেদের শেকড় ও ভারতীয়ত্ব নিয়ে গর্ববোধ করার পাশাপাশি এক সহানুভূতিশীল, দক্ষ এবং দায়িত্বশীল বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে। আর তাই এই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই বর্তমান গবেষণাপত্রে "বিকাশমান ভারতের ভিত্তি:বর্তমান শিক্ষাকাঠামোয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র একটি সামগ্রিক রূপরেখা" বিষয়টি লেখার চেষ্টা করা হল।

উদ্দেশ্য: বর্তমান গবেষণাপত্রটির মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা। এবং ১৯৮৬ সালের প্রথাগত ও পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক শিক্ষানীতির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞাননির্ভর বিশ্বের উপযোগী একটি আধুনিক, সৃজনশীল এবং বহুমুখী শিক্ষাকাঠামো গঠনে এই নতুন নীতি কীভাবে কাজ করছে, তা তুলে ধরা। এছাড়া মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় এবং সর্বজনীন গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভারতকে একটি বৈশ্বিক জ্ঞানশক্তিতে (Global Knowledge Superpower) পরিণত করার যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে, তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা প্রদান করা এবং সে সম্পর্কে পাঠক সমাজকে অবগত করা।

বিকাশমান ভারত (Viksit Bharat 2047): 'বিকাশমান ভারত' বা 'উন্নত ভারত ২০৪৭' হলো ভারত সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা ভিশন। এর মূল লক্ষ্য হলো ২০৪৭ সালে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তিতে দেশটিকে একটি সম্পূর্ণ উন্নত এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা। যার প্রধান লক্ষ্য হলো একদিকে ভারতের অর্থনীতিকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলা এবং পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন, অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা, বিজ্ঞান, গবেষণা, ডিজিটাল

পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেওয়া এবং পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা।

জাতীয় শিক্ষা: "জাতীয় শিক্ষা"-কে ইংরেজিতে প্রধানত National Education বলা হয়। এছাড়া, এটি সাধারণত কোনো নীতি বা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হলে National Education Policy (NEP) বা National Education System হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।

"জাতীয় শিক্ষা হল একটি নির্দিষ্ট স্তর অবধি জাতি, ধর্ম, অঞ্চল, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য এবং সমানভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সেইসঙ্গে শিক্ষা হবে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মূল বিষয়। জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে দেশে সমাজতন্ত্র ত্বরান্বিত হবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, গণতন্ত্র বিষয়ক ধারণা, বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবধারা, স্বাধীন মানসিকতা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক অসাম্য দূর হবে।"[২]

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020: ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করে তুলতে প্রবর্তিত হয়েছে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০'। প্রথাগত মুখস্থবিদ্যার বদলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং বাস্তবমুখী দক্ষতার সার্বিক বিকাশে এই নীতি বিশেষ জোর দেয়। এর আওতায় পুরনো ১০+২ পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে ৩ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্য ৫+৩+৩+৪ স্তরের এক নতুন পরিকাঠামোর প্রবর্তন করা হয়েছে। বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলার মধ্যকার প্রথাগত বিভাজন দূর করে এক বহুমুখী ও উন্মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দমতো বিষয় পড়ার স্বাধীনতা পাবে। শিক্ষার ভিত শক্ত করতে অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় পঠনপাঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের অল্প বয়স থেকেই স্বনির্ভর করে তুলতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে কোডিং-এর মতো আধুনিক বৃত্তিমূলক ও হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ রাখা হয়েছে। সর্বোপরি, শিক্ষাকে চাপমুক্ত করতে প্রথাগত পরীক্ষার ভীতি দূর করে বছরব্যাপী এক সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এখানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৯৮৬ এবং ২০২০ সালের শিক্ষানীতির মধ্যবর্তী গুণগত পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে মাধ্যমিক উৎস বা Secondary Data হিসেবে শিক্ষানীতির খসড়া, সমসাময়িক বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষা কাঠামোয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র একটি সামগ্রিক রূপরেখা:

শিক্ষা হলো কোনো জাতির মেরুদণ্ড এবং সমাজের প্রগতির মূল চালিকাশক্তি। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে শিক্ষাব্যবস্থা কেবল জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি সামাজিক রূপান্তর ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার। ব্রিটিশ আমলের কেরানি তৈরির শিক্ষা থেকে শুরু করে আজকের একবিংশ শতাব্দীর 'স্কিল-বেসড' বা দক্ষতা-নির্ভর শিক্ষা—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা অনেক চড়াই-উতরাই পার করেছে। এই বিবর্তনের সর্বশেষ এবং সম্ভবত সবচেয়ে বৈপ্লবিক সংযোজন হলো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020)। আসলে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ যখন ডিজিটালাইজেশন এবং বিশ্বায়নের পথে হাঁটতে শুরু করে, তখনই অনুভূত হয়েছিল যে ১৯৬৮ বা ১৯৮৬ সালের পুরনো শিক্ষানীতি বর্তমান সময়ের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। আর তখনই প্রয়োজন পড়ে নতুন শিক্ষানীতির। তাই বলা যায় যে, ২০২০ সালের শিক্ষানীতিটি প্রথাগত ধ্যানধারণার এক বৈপ্লবিক রূপান্তর। এটি আর পুরোনো নীতিগুলোর মতোই কেবল 'সাক্ষরতা' বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি 'শিক্ষার গুণমান' এবং 'ব্যক্তিগত দক্ষতা'

বৃদ্ধির কথাও বলে। এই রূপরেখায় প্রথম এবং প্রধান পরিবর্তনটি এসেছে শিক্ষাকাঠামোতে। বর্তমান কাঠামোয় এই শিক্ষানীতির গ্রহণীয়তা বিচার করতে গেলে দেখা যায়, এটি দীর্ঘদিনের শিকল ভাঙার এক সাহসী প্রচেষ্টা। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর প্রবর্তিত এই নীতিতে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত এক বিশাল সংস্কারের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পুরনো '১০+২' ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তিত হয়েছে '৫+৩+৩+৪' কাঠামো। এই কাঠামোটি কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন নয়, বরং এর গভীরে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিশুর তিন বছর বয়স থেকেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথাগত শিক্ষার আওতায় এনে তার বৌদ্ধিক বিকাশের বনিয়াদ মজবুত করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। ১৯৮৬ সালের নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কিন্তু ২০২০-র নীতি সেই গুরুত্বকে শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার (ECCE) স্তরে নিয়ে গেছে, যা আধুনিক শিশুমনস্তত্ত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। আশা করা যায়,শৈশবের এই প্রারম্ভিক বিকাশ বা 'আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন' শিশুর সামগ্রিক বিকাশে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করতে পারবে।এছাড়া আধুনিক শিক্ষাধারার বিবর্তনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি এসেছে দৃষ্টিভঙ্গিতে। আগে যেখানে শিক্ষা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক এবং মুখস্থ-নির্ভর, আজ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এবং প্রয়োগমূলক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এই বিবর্তনকে এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এই নীতির প্রধান স্তম্ভগুলি হলো—অ্যাক্সেস (প্রবেশাধিকার), ইক্যুইটি (সমতা), কোয়ালিটি (গুণমান), অ্যাফোর্ডেবিলিটি (সাশ্রয়যোগ্যতা) এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি (জবাবদিহিতা)। এর সাথেই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর অন্যতম প্রশংসনীয় এবং গ্রহণীয় দিকটি হলো শিক্ষার বহুমুখিতা। আধুনিক শিক্ষাধারায় আমরা জানি যে, একজন শিক্ষার্থী কেবল বিজ্ঞান বা কেবল কলা বিভাগে দক্ষ হবে এমনটা নয়। এই নীতিতে বিষয়ের কঠোর বিভাজন (Hard Separation) তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে একজন ছাত্র চাইলে পদার্থবিদ্যার সাথে ফ্যাশন ডিজাইনিং বা ইতিহাসের সাথে গণিত পড়তে পারে। এই নমনীয়তা শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতাকে বিকশিত করে এবং তাকে কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলে। এটি আসলে শিক্ষার এক গণতান্ত্রিক রূপ, যেখানে শিক্ষার্থী নিজের মেধা ও রুচি অনুযায়ী পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পায়। ভাষার প্রশ্নেও এই নীতির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন লক্ষণীয়। ১৯৮৬ সালের নীতিতে ত্রিভাষা সূত্রের কথা বলা হলেও, কালক্রমে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার এক ধরনের সামাজিক প্রাধান্য তৈরি হয়েছিল। ২০২০ সালের নীতি মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার ডাক দিয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব এই নতুন শিক্ষানীতির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আবেগপ্রসূত দিক। এই নীতিতে অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত (সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) মাতৃভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় পাঠদানের সুপারিশ করা হয়েছে, কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক স্তরে শিশু তার আপন ভাষায় বা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিলে শিশুর শিখন ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিলে শিশুরা বিষয়বস্তু সবচেয়ে দ্রুত এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আমাদের মতো বহুভাষিক দেশে যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা কেবল ভাষার বাধার কারণে মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, সেখানে এই পদক্ষেপের গ্রহণীয়তা অপরিসীম। এটি কেবল ভাষাগত প্রেম বা শিক্ষার প্রসারই নয়, বরং শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ।এর সাথে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার এক মহান প্রয়াসও বটে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও রূপান্তরের চিত্রটি এই ২০২০ সালের রূপরেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট। বলা ভালো উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই নীতি এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। '১৯৮৬ সালের কাঠামোয় ডিগ্রি অর্জনই ছিল শেষ কথা। আর্থিক অভাব বা ব্যক্তিগত কারণে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তার ফলে মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়লে পূর্বের নীতিতে তার কোনো মূল্যায়ন হতো না। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা তাদের দীর্ঘ পরিশ্রমের কোনো স্বীকৃতিই পেত না। কিন্তু বর্তমান সময়ের বাস্তবতাকে মাথায় রেখে ২০২০ সালের নীতিতে প্রবর্তিত 'মাল্টিপল এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট' ব্যবস্থা উচ্চশিক্ষায় এক আমূল পরিবর্তন এনেছে। একজন শিক্ষার্থী যদি এক বছর পর পড়া ছাড়েন তবে তিনি পাবেন সার্টিফিকেট, দু বছর পর ডিপ্লোমা এবং পুরো পাঠ্যক্রম শেষ করলে ডিগ্রি। এর ফলে যেমন অর্জিত শিক্ষা বিফলে যাবে না ও শিক্ষার অপচয় রোধ হবে তেমনি

সেটি 'অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অব ক্রেডিট' (ABC) -এ তা জমাও থাকবে। আর এই ABC ব্যবস্থাটি ডিজিটাল যুগে শিক্ষার আদান-প্রদানকে অনেক বেশি সহজতরও করে তুলবে। এটি হল আসলে একটি জীবনমুখী এবং বাস্তবসম্মত এক পদক্ষেপ, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হওয়া অগণিত শিক্ষার্থীর স্বপ্নকে সম্মান জানায়। মূল্যায়ন বা পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই নীতির দর্শন ১৯৮৬-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৮৬ পরবর্তী সময়ে বোর্ড পরীক্ষা এবং নম্বর পাওয়ার ইঁদুর দৌড় শিক্ষার্থীদের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। ২০২০ সালের নীতিটি এই 'একদিনের পরীক্ষা' বা 'বার্ষিক মূল্যায়ন'-এর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলেছে। এখানে মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'ফর্মাটিভ অ্যাসেসমেন্ট' বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের ওপর। রিপোর্ট কার্ডটি এখন আর কেবল শিক্ষকের মন্তব্য নয়, বরং সেখানে স্থান পাবে সহপাঠীদের মূল্যায়ন সহ শিক্ষার্থীর নিজের মূল্যায়নও। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী এর মাধ্যমে নিজেকে চিনতে শিখবে, তার সবল ও দুর্বল দিকগুলোও বুঝতে পারবে। এছাড়া গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও ২০২০ সালের নীতি ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছে। 'ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন' গঠনের মাধ্যমে দেশে গবেষণার একটি সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির লক্ষ্য এটিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে ১৯৮৬ সালের নীতিতে গবেষণার সুযোগ ছিল সীমিত এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে ২০২০ সালের নীতি সমগ্র উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার সংস্কৃতিকে সংক্রামিত করতে চাইছে। এর সাথেই বিদেশি নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভারতে ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দান এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বমানের করে তোলার লক্ষ্যটি প্রমাণ করে যে ভারত এখন শিক্ষা-রপ্তানিকারক দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। শিক্ষক সমাজের ভূমিকাও এই নীতিতে ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে যেখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল সেখানে ২০২০ সালের নীতি শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এসব ছাড়া রয়েছে ২০২০-র নীতিতে প্রযুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মূলত প্রযুক্তি নির্ভরতা হল এই নতুন নীতির অন্যতম স্তম্ভ। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে ই-লার্নিং, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং কৃত্রিম মেধার (AI) ব্যবহার শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার অঙ্গীকার করেছে। আসলে ১৯৮৬ সালের নীতি যখন লেখা হয়েছিল, তখন ইন্টারনেট ছিল অলীক কল্পনা; আজ ২০২০-র নীতিতে প্রযুক্তিই হলো শিক্ষার প্রাণভ্রমরা।

সুতরাং একথা বলাই যায় যে,শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড। একটি দেশ কতটা উন্নত হবে, তা নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থা কতটা প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যৎমুখী তার ওপর। স্বাধীন ভারতে প্রথম শিক্ষানীতি এসেছিল ১৯৬৮ সালে। এরপর ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর আমলে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়, যা ১৯৯২ সালে সামান্য সংশোধিত হয়েছিল। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর, ২০২০ সালে ভারত সরকার নতুন শিক্ষানীতি (NEP 2020) ঘোষণা করে, যা একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক চাহিদার সাথে তাল মেলাতে ভারতের শিক্ষাকাঠামোকে আমূল বদলে দেওয়ার লক্ষ্য রাখে। অর্থাৎ, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কেবল একটি নথিপত্র নয়, এটি একটি স্বপ্ন—ভারতকে পুনরায় 'বিশ্বগুরু' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন।

ভারতীয় শিক্ষাধারার বিবর্তন: একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত তার শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছে।

* রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯): উচ্চশিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দেয়।

* কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬): প্রথমবার একটি সুসংগত জাতীয় শিক্ষানীতির রূপরেখা তৈরি করে, যার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় ১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতি।

* জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬: এটি দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের শিক্ষাকাঠামো পরিচালনা করেছে, যেখানে মূলত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং বৈষম্য দূরীকরণে জোর দেওয়া হয়েছিল।

* একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা: বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের ফলে ১৯৮৬-এর পুরনো ধাঁচের শিক্ষা বর্তমান প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিল। এই শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যেই তিন দশক পর নতুন শিক্ষানীতির আবির্ভাব।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মূল স্তম্ভসমূহ: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর ভিত্তি মূলত পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। সেগুলি হলো- ১.এক্সেস (প্রবেশাধিকার), ২.ইক্যুইটি (সাম্য), ৩.কোয়ালিটি (গুণমান), ৪.অ্যাফোর্ডাবিলিটি (সাশ্রয়ী মূল্য) এবং ৫.অ্যাকাউন্টেবিলিটি (জবাবদিহিতা)।

১. কাঠামো (৫+৩+৩+৪ পদ্ধতি): ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতির প্রধান ভিত্তি ছিল ১০+২ কাঠামো। যেখানে প্রথম দশ বছর সাধারণ শিক্ষা এবং পরবর্তী দুই বছর উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিশেষায়িত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। তবে এই নীতিতে পুরনো ১০+২ কাঠামোকে ভেঙে নতুন ৫+৩+৩+৪ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

* ফাউন্ডেশনাল স্টেজ বা বুনিয়াদী স্তর (৫ বছর): এই বুনিয়াদী স্তরে দুটি ধাপ আছে।

(1) অঙ্গনওয়ারী বা বালবাটিকা বা প্রাক-প্রাথমিক (3-6 বছর)

(2) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি (6-8 বছর)

ফাউন্ডেশনাল স্তরটি পাঁচ বছরের যেখানে নমনীয়, বহুস্তরীয়, খেলার ছলে শিক্ষা ও উৎসাহ-ভিত্তিক এবং শ্রেণিকক্ষে আন্তঃক্রিয়াকলাপভিত্তিক জ্ঞানলাভের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, যা ইসিসিই এর পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে গঠিত হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি-2020 একটি প্রধান সুপারিশ হল দ্বিতীয় শ্রেণির শেষে সব পড়ুয়া যাতে বুনিয়াদী শিক্ষা (বলতে, পড়তে ও বুঝতে শেখা এবং গনিতের প্রাথমিক জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো) আয়ত্ত করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা।

* প্রিপারেটরি স্টেজ বা প্রস্তুতিকরণ স্তর (৩ বছর) : এটি তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি (8-11বছর) পর্যন্ত, তিনবছরের হবে। যেখানে ফাউন্ডেশনাল স্তরের খেলাধূলা, অন্বেষণ এবং কার্যকলাপ ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতির ও পাঠ্য প্রণালীর সাথে সাথে কিছু সহজ-সরল পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক শিক্ষণও শুরু করা হবে। এখানে পড়া, লেখা, কথা বলা, শারীরশিক্ষা, শিল্প, ভাষা, বিজ্ঞান এবং গণিত সহ সমস্ত বিষয়ে একটি শক্ত ভিত তৈরি করার জন্য পঠন পদ্ধতি আরও প্রথাগত কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ করা হবে।

* মিডল স্টেজ বা মধ্যম স্তর (৩ বছর) : মধ্যম স্তরটি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি অবধি অর্থাৎ তিনটি শিক্ষাবর্ষ নিয়ে গঠিত। এখানেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার (Vocational Education) হাতেখড়ি হবে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে। এছাড়া এই স্তরে, প্রস্তুতিকরণ স্তরের শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠপ্রণালীর সাথে সাথে বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের আরও বিমূর্ত ধারণার শিক্ষা ও আলোচনাও করা হবে। এই কার্যক্রম বিজ্ঞান, গণিত, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানসিক বিষয়ে হবে, পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে (এক্সপেরিমেন্টাল লার্নিং)। এছাড়া শিক্ষণ এবং বিভিন্ন বিষয় এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এসে যাওয়া সত্ত্বেও বিষয়গুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক অনুভব করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে এই স্তরে উৎসাহিত করা হবে।

* সেকেন্ডারি স্টেজ বা মাধ্যমিক স্তর (৪ বছর : মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারী স্তরটি বহু-বিষয়ক অধ্যয়নকে যুক্ত করে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অর্থাৎ চারটি শিক্ষাবর্ষ নিয়ে গঠিত। এখানে কোনো নির্দিষ্ট 'স্ট্রিম' (Arts, Science, Commerce) থাকবে না; শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমতো বিষয় বেছে নিতে পারবে। বিশেষ করে দশম শ্রেণির পর ইচ্ছানুযায়ী বৃত্তিমূলক বা অন্য কোন

বিশেষজ্ঞতাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে বিকল্প বিষয় পছন্দ করার সুযোগ থাকবে। এছাড়া এই স্তরটি মধ্যম স্তরের শিক্ষণ প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হলেও, এখানে বিষয় সম্পর্কীত অধিক গভীরতা,অধিক আলোচনাত্মক চিন্তাভাবনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ বলা যায় যে, ভারতের এই নতুন শিক্ষানীতিটি প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক ও যুগোপযোগী '৫+৩+৩+৪' বিন্যাস প্রবর্তন করেছে। যার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের মানসিক ও জ্ঞানীয় (কগনিটিভ ডেভলপমেন্ট) বিকাশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাদান করা। প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত এই কাঠামোটি মূলত মুখস্থবিদ্যার চিরাচরিত প্রথা ভেঙে বাস্তবমুখী বোধগম্যতা, সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে শিক্ষাপদ্ধতিতে পাঠ্যক্রমের বোঝা কমিয়ে মৌলিক বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে শিক্ষা বা 'এক্সপেরিমেন্টাল লার্নিং'-এর সুযোগ পায়। এছাড়া এখানে শিল্পকলা, খেলাধুলা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মূল পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি একুশ শতকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর এই সাথেই এই নীতিতে বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নমনীয়তা আনয়ন করা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান, মানবিক বা বাণিজ্যের মতো কঠোর বিভাজন তুলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পছন্দ ও জীবন-আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সামগ্রিকভাবে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা কেবল জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমই নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ও চরিত্র নির্মাণের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। একই সাথে এটা রাষ্ট্রীয় ও রাজ্যস্তরে পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বিকাশের জন্য পথপ্রদর্শকও বটে ।

২. পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার মাধ্যম : এই নীতির একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো অন্তত পঞ্চম শ্রেণি (সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণি) পর্যন্ত মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান। এটি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক এবং পড়াশোনার প্রতি ভীতি দূর করতে কার্যকর। এছাড়া এই রূপরেখায় পড়াশুনার সাথেই সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকেও সমান ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে খেলাধুলা, শিল্পকলা বা সঙ্গীতকে এখন আর 'অতিরিক্ত' বিষয় হিসেবে দেখা হবে না। এগুলিকেও মূল পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে। এর সাথে এই নীতিতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই কোডিং এবং ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেও পারদর্শী করে তুলতে সক্ষম হবে।

৩. উচ্চশিক্ষা ও নমনীয়তা: ১৯৮৬ সালের নীতিতে উচ্চশিক্ষার কাঠামো ছিল বেশ অনমনীয়। একবার কোর্স ছেড়ে দিলে পুনরায় যোগ দেওয়া কঠিন ছিল এবং বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কলা, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর ছিল। তবে নতুন এই নীতিতে উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা চাইলে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে আবার পরে শুরু করতে পারবে। অর্থাৎ এখানে 'মাল্টিপল এন্ট্রি এবং এক্সিট'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী এক বছর পর পড়াশোনা ছাড়লে 'সার্টিফিকেট', দুই বছর পর 'ডিপ্লোমা' এবং তিন বা চার বছর পর 'ডিগ্রি' পাবে। এতে 'ড্রপ-আউট' সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়াও এই নীতিতে একাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট (ABC)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যার মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের উপার্জিত
ক্রেডিট জমা রাখা হবে, যা উচ্চশিক্ষায় সহায়ক হবে। একি সাথে UGC বা AICTE-এর বদলে একটিমাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থার Higher Education Commission of India (HECI)-র প্রস্তাব করা হয়েছে,যা কিনা একাই উচ্চশিক্ষার মানকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এছাড়া ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় 'গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও' (GER)-এর হার বাড়িয়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যও এতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. মূল্যায়ন পদ্ধতি: ১৯৮৬ সালের নীতিতে বার্ষিক পরীক্ষা এবং মুখস্থ বিদ্যার ওপর প্রবল গুরুত্ব ছিল। কিন্তু ২০২০ সালের শিক্ষানীতি সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে 'সামগ্রিক মূল্যায়ন' (Holistic Assessment)-এর কথা বলেছে। রিপোর্ট কার্ডে শুধু নম্বর নয়, বরং শিক্ষার্থীর দক্ষতা, সহপাঠীদের মূল্যায়ন এবং আত্ম-মূল্যায়ন প্রতিফলিত হবে।

৫. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা: ১৯৮৬ সালে যেখানে শিক্ষকদের জন্য DIET-র মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে ২০২০ সালের নীতিতে শিক্ষক হওয়ার জন্য বা শিক্ষকতার মানোন্নয়নে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪-বছরের সমন্বিত বি.এড. (Integrated B.Ed.) ডিগ্রি হবে শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা। অর্থাৎ, শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা হবে ৪ বছরের সমন্বিত বি.এড (B.Ed) ডিগ্রি। এছাড়া এর পাশাপাশি দেশে গবেষণার প্রসারের জন্যও 'ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (NRF) গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুতরাং একথা বলাই যায় যে,জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর লক্ষ্য অত্যন্ত মহৎ। যেখানে দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী করে তোলার জন্য বা বলা ভালো তাদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদা বা 'ডিগনিটি অফ লেবার' বোধ তৈরি করার জন্য কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বরং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই কোডিং বা ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে কেবল তথ্য মুখস্থ করে টিকে থাকা অসম্ভব; সেখানে প্রয়োজন বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যা এই শিক্ষানীতির মূল সুর। একই সাথে এই নীতিতে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ হ্রাস করতে বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের (Continuous Evaluation) ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গবেষণায় জোয়ার আনার জন্যে 'ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন' গঠন করার ও করোনা-পরবর্তী বিশ্বে অনলাইন বা ডিজিটাল শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রযুক্তিবান্ধব পরিকাঠামো তৈরি করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে যেকোনো নতুন চিন্তাধারা বা নীতির গ্রহণীয়তা নির্ভর করে তার সার্থক রূপায়ণের ওপর। আর ভারতের মতো বিশাল জনপদে এর বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। কারণ, যেখানে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে এখনো বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবস্থা নেই বা বলা ভালো পরিকাঠামোগত অভাব রয়েছে সেখানে প্রস্তাবিত এই ডিজিটাল শিক্ষা কতটুকু কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এছাড়া বহুভাষিক দেশে মাতৃভাষায় শিক্ষার ধারণাটি চমৎকার হলেও, চাকরির বাজারে ইংরেজির আধিপত্য থাকায় অনেক অভিভাবক এতে দ্বিধাগ্রস্ত। একই সাথে এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য জিডিপির ৬% শিক্ষা খাতে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে, যা বর্তমানে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম এবং তার সঠিক বাস্তবায়নই এই নীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। এছাড়া এই আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, যা একটি বিশাল কর্মযজ্ঞও বটে। অন্যদিকে বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলো (যেমন ফিনল্যান্ড বা জাপান) যেখানে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার ওপর জোর দেয় সেখানে NEP 2020 ভারতকে সেই বৈশ্বিক মানদণ্ডে উন্নীত করার একটি প্রচেষ্টা। এটি শিক্ষার্থীদের 'মুখস্থবিদ্যা'র খাঁচা থেকে বের করে 'কীভাবে শিখতে হয়' (Learning how to learn) সেই পথ দেখায়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষে বর্তমান সরকার NEP 2020 তৈরির যে মহৎ সংকল্প গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ আজ কেবল একটি দালিলিক পরিবর্তন নয়, এটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্জাগরণ। আর এদেশের ঐশ্বর্যশালী ঐতিহ্য ও প্রাচীন শাশ্বত ভারতীয় জ্ঞান ও চিন্তাই এই জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকবর্তিকা হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। এর গ্রহণীয়তা আজ আর তর্কের বিষয় নয়, বরং সময়ের প্রয়োজন। কেবল সরকারি নির্দেশে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, যদি সঠিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই নীতিকে বাস্তবায়িত করা যায়, তবে ভারত আবার বিশ্বমঞ্চে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে। ভারতবর্ষের মানুষ সন্ধান পাবে

বহু আকাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি ও প্রগতির নতুন দিগন্ত, গড়ে উঠবে সুন্দরতর ভারতবর্ষ। যদিও এটির বাস্তবায়নের পথে অনেক কাঁটা রয়েছে, তবুও সঠিক পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা থাকলে এই নীতি ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলবে। আসলে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এবং দেশের যুবশক্তিকে প্রকৃত সম্পদে পরিণত করার জন্য এই বিবর্তন ছিল অপরিহার্য। শিক্ষা কেবল জীবিকা নির্বাহের পথ নয়, এটি হোক আলোকিত মানুষ হওয়ার পাথেয়। আর সেই আলোর পথেই যাত্রা শুরু করেছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। শিক্ষার এই নতুন আলো যেন সমাজের শেষ প্রান্তের শিক্ষার্থীর কাছেও পৌঁছায়, এটাই হবে সকলের লক্ষণীয়। তবেই এই মহৎ উদ্যোগের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

উৎস নির্দেশাবলী:

১) শিক্ষাবিজ্ঞান, ড.দেবাশীষ পাল,রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা,পৃষ্ঠা ৪০৪

২) সমকালীন ভারত ও শিক্ষা, ড.দেবাশীষ পাল, রীতা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা 134

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা:

১) ”Liberal Education”-A 21st Century Initiative” Fifteenth Foundation Day Lecture, Dr. K. Kasturirangan, NIEPA, New Delhi, 2021

২) National Education Policy (Final Circular)-2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India, (www.mhrd.gov.in)

৩) N.E.P(2020)(https://www.education.gov.in/sites/upload_ules/mhrd/ules/NEP_Final_English_0.pdf)

৪) Draft NEP (2019), National Education Policy (Document), Retrieved from https://mhrd.gov.in>sites>mhrd>files>Draft-NEP-2019-EN-Revised

৫) NEP (2020), National Education Policy (Document), Retrieved from https://ijcrt.org/download.php?file=IJCRT2101423.pdf

৬) Rupesh, G., S & Umesh, B., S (2021). National Education Policy 2020 and Higher Education: A brief Review. International Journal of Creative Research Thought, 9(1), 2320-2882. Retrieved https://ijcrt.org/download.php?file=IJCRT2101423.pdf from

৭) শিক্ষা দর্শনের রূপরেখা, অভিজিৎ কুমার পাল, ক্লাসিক বুক, কলকাতা, ২০১০

৮) শিক্ষার ভিত্তি ও বিকাশ, ড.দেবাশীষ পাল, ধর, দাস, ব্যানার্জি, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা,২০০৫

৯) শিক্ষাবিজ্ঞান, ড.দেবাশীষ পাল, সাহু, ছায়া প্রকাশনী প্রা.লি., কলকাতা,২০১৮

১০) শিক্ষাবিজ্ঞান, ড.দেবাশীষ পাল,রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা,২০২৪

১১) সমকালীন ভারত ও শিক্ষা, ড.দেবাশীষ পাল, রীতা পাবলিকেশন, ২০১৭

১২) সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা, ড. দুলাল মুখোপাধ্যায়, হালদার, চন্দ, আহেলী পাবলিশার্স, ২০১৬

১৩) ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, ভক্তিভূষণ ভক্তা, অ-আ-ক-খ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫

১৪) ভারতের শিক্ষা ও শিক্ষার ভারতায়ন, সুশীল রায়, সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা,২০০১